ধারাবাহিক রচনা

নবদুর্গা ও ভগবতী সারদা

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

নবরাত্রির ষষ্ঠী তিথির দেবী কাত্যায়নী—ঋষি কাত্যায়নের কন্যা। কাত্যায়ন এক অদ্ভুত প্রার্থনায় কঠোর তপস্যা করে চলেছেন—দেবীশক্তিকে তিনি কন্যারূপে চান। আশ্চর্য! পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য সকলে তো পুত্র চায়! কাত্যায়ন কিন্তু কন্যা চাইলেন। গিরিরাজ হিমালয়ও দেবীকে কন্যারূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা বোধহয় তখনই বুঝেছিলেন, বহু দায়িত্বের ভারে পুত্র যদিও বা ভুললেও ভুলতে পারে, কন্যা পরগৃহের ধন হলেও সে পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে গমনের সময় বুকের কুঠুরিতে সম্পূর্ণ বাপের বাড়িটা পুরে নিয়ে চলে যায়। তাই মৃত্যু-পরবর্তী কৃত্যের কথা জানা নেই, কিন্তু ইহলোকে বাপসোহাগী, মায়ের বল-ভরসা মেয়েটি এঘর বা ওঘর—যেখানেই থাকুক না কেন—বাবা-মায়ের জন্য তার প্রাণের আকুলিবিকুলি কোনওদিনই ফুরোয় না। নন্দনন্দন মথুরায় গেলেন বৃহত্তর কর্তব্য পালনের জন্য, দ্বারকাধীশ হয়ে আরও কাজে জড়িয়ে পড়লেন—কতরকমের বিচিত্র দায়িত্ব তাঁর। নন্দালয়ে আর ফেরা হল না—সেই কিশোরবেলার বৃন্দাবনে ফেরার সময়ই হল না। অথচ হিমালয়দুহিতা যতই সংসার সামলান না কেন—যতই সারা বিশ্বের জননী হয়ে জগৎপালন করুন না কেন—প্রতি আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীর সন্ধ্যা থেকে দশমীর সকাল পর্যন্ত তিনি যেমন করেই হোক বাবা-মাকে দেখতে আসবেনই।

কাত্যায়ন মুনি যখন প্রার্থনাপর, তখন মহিষাসুরের পীড়ন থেকে সকলকে রক্ষার জন্য সব দেবতার তেজ সংহত হতে থাকে। দিগন্তব্যাপী সেই বিরাট পাহাড়ের মতো তেজঃপুঞ্জ জ্বলতে শুরু করে—''অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।'' পুরাণমতে সেই তেজোরাশি সম্মিলিত হয় কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে। সেই আলোকপুঞ্জ থেকে—'একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'—ত্রিলোকব্যাপিনী এক অপরূপা নারীমূর্তি জন্ম নেয়। তাঁর সাধনবলে কন্যামূর্তির প্রথম আবির্ভাব তাঁরই আশ্রমে, তাই দেবী কাত্যায়নকন্যা কাত্যায়নী। কাত্যায়ন ঋষি দেবীর আবাহন ও বোধন করেছিলেন এক বেলগাছের তলায়। তাই প্রতি আশ্বিন শুক্লা ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষমূলে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর বোধন হয়।

মনে পড়ে, শিহড়গ্রামের বেলগাছতলায়

বেলাশেষের এক ছায়াঘন অন্ধকারে, শরীরটা ভাল লাগছে না বলে এসে বসেছিলেন জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী দেবী। হঠাৎ বেলগাছ থেকে শোনা যায় গয়নার ঝমঝম—একটি লালচেলি পরা ছোট্ট টুকটুকে মেয়ে নেমে আসে বেলগাছ থেকে, পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে শ্যামাসুন্দরীর—জ্ঞান হারান তিনি। পরে অনুভব করেন সেদিনের বিল্ববৃক্ষমূলে বোধনের বীজ তাঁর শরীরে। দশমাস দশদিন পর পৌষমাসে—নিরাকারা কৃপা করি, সাজিলে মানবী নারী—শ্যামাসুন্দরী এক আশ্চর্য নারীর জন্ম দেন—কাত্যায়ন রামচন্দ্রের কন্যা কাত্যায়নী সারদা।

কাত্যায়নী

নবরাত্রির সপ্তম তিথির দেবী কালরাত্রি।

রাত্রিদেবী নির্বিচারে সব প্রাণীকে বিশ্রামসুখ দেন। নিশ্চিন্ত নিদ্রার আরাম আসে রাত্রিতে। শরীররক্ষার যে-কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায় আছে তার অন্যতম হল নিদ্রা এবং যোগীরা বলেন রাত্রি দশটা থেকে সকাল চারটে পর্যন্ত যদি কেউ নিশ্ছিদ্র, নিরুপদ্রবে ঘুমোতে পারে তাহলে তার আর সারাদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। সারাদিনের কর্মশ্রমে শরীরের যে-ক্ষয় হয় তার পূরণের জন্য নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত্রি তাই জননীর মতন প্রাণীর শরীরের রক্ষা করে। নিদ্রায় আমাদের বাহ্যচেতনা থাকে না। স্বপ্নহীন সুষুপ্তির গভীরে বিলীন হয়ে যায় আমিত্ব।

জাগতিক নিয়মের গভীরে আর-এক রাত্রি আছে—তার নাম মহারাত্রি, যার আর-এক নাম মহাপ্রলয়। মহারাত্রিতে লয় পেয়ে যায় সমস্ত বিশ্ব—নিখিল জগৎ ঘুমিয়ে পড়ে মার কোলে। আবার নতুন উদ্যমে জন্ম নেয় নতুন সৃষ্টি, মায়ের শক্তিতে। মহারাত্রিতে সব ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে থাকেন একমাত্র বিষ্ণু—সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরচেতনা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হল কালরাত্রি। যখন কালরাত্রি তাঁর সুখনিদ্রার জাদুকরী ঘুমের কাঠি বুলিয়ে দেন সবার চোখে, তখন বিষ্ণুও ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু কর্ম থেকে বিশ্রাম নেওয়া ঈশ্বর কী করেন? কেবল নিদ্রিত থাকেন? না, তিনি সাধারণ প্রাণীর মতন সুষুপ্তিতে অচেতন হন না, ভুলে যান না সব। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি, ‘‘যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুঃ জগত্যেকার্ণবীকৃতে।/ আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥’’—প্রলয়ের সময় যখন পৃথিবী এক কারণসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, তখন সৃষ্টির আদিকারণ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় ভজনা করছিলেন। কাকে ভজনা করছিলেন?—কালরাত্রি দেবীকে, দেবী যোগমায়াকে—যার প্রভাবে যোগনিদ্রায় যোগারূঢ় হয়ে, সৃষ্টিক্রিয়া থেকে বিরত থেকে তিনি নিজের স্বরূপে বিলীন হয়ে আছেন। মহাকালও তখন থাকেন না, থাকেন মহাকালিকা। যে- আদিশক্তি তখন একমাত্র স্পন্দিত হতে থাকে, তিনি কালরাত্রি দেবী।

সেই তিথিটা সপ্তমী ছিল না, ছিল ঘোর

অমাবস্যা—কিন্তু সেখানে বিষ্ণু ভজনা করছিলেন সামনে গভীর ধ্যানে নিমগ্না এক অষ্টাদশীর। তারপর দুজনেই গভীর থেকে আরও গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। কোন যোগধ্যানে তাঁরা যোগনিদ্রাকে স্পর্শ করেছিলেন জানি না। রাত দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেলে অর্ধবাহ্যদশায় সেই মহাকারণের ধ্যানের গভীর থেকে ব্যুত্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ বিষ্ণু দেবীর চরণে নিবেদন করলেন নিজেকে, জপমালাটি তাঁর পায়ে অর্পণ করলেন।

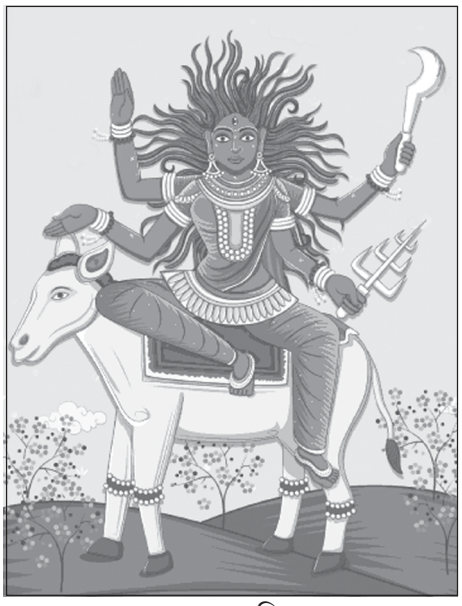

কালরাত্রি

ঈশ্বরের পূজ্যা যে-ঈশ্বরী তিনি কালরাত্রি দেবী, বিঘ্ননাশ করেন, সিদ্ধি দেন। কালরাত্রির কুণ্ডলিনী শক্তি সেই ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে জাগ্রতা হয়েছিলেন, আর আজও সেই পরমা শক্তি 'মা' হয়ে আমাদের বিঘ্ননাশ করে চলেছেন।

মহাষ্টমীর দেবী মহাগৌরী।

পার্বতী শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর সংকল্প ছিল, তুলসীদাসের ভাষায়—''জন্মকোটি লাগি রগর হমারী।/ বরউঁ শম্ভু ন ত রহউঁ কুঁয়ারী''—কোটি জন্ম যায় যাক, শম্ভুকে না পেলে আমি কুমারীই থাকব। কখনও তিনি মাত্র একটি পাতা খেয়ে থাকছেন, তখন তিনি 'একপর্ণা'; কখনও বা কিচ্ছু খাচ্ছেন না, একটি পাতাও না—তখন তিনি 'অপর্ণা'। এভাবে তপস্যায় তপস্যায় তাঁর সোনার বরণ কালো হল। তারপর তো শিব এলেন, তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন—বাঞ্ছিত আনন্দে কৈলাসে তিনি চললেন পতিগৃহে।

এদিকে শ্মশানে-মশানে ধ্যান-সমাধিতে ডুবে থাকা শিবঠাকুরটি রগড়ও করেন। একদিন দিলেন উমাকে খেপিয়ে। তাঁকে বললেন 'কালো মেয়ে'। খুব মানে লাগল নন্দিনীর, তিনি তো স্বর্ণবর্ণাই ছিলেন! ''ঠিক আছে, দেখে নিয়ো আবার ওই একইরকম তপস্যা করে পুরনো রংটা ফিরিয়ে নিয়ে আসব''—বলে রওনা দিলেন তপস্যার জন্য। শিবঠাকুর প্রমাদ গুনলেন—তিনি যে একটি ক্ষণও পার্বতীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না, সে রাগ করে চলে গেলে কী হবে? সযত্ন স্নেহে গঙ্গাজলে ধুয়ে দিলেন পত্নীর কৃষ্ণবর্ণ—আর পার্বতীর অঙ্গকান্তি হয়ে উঠল 'বিদ্যুৎকান্তিসমপ্রভা'। বিদুতের মতন দীপ্তিময়ী গৌরাঙ্গী হলেন তিনি, আরও আরও গৌরবর্ণা—তাঁর নাম হল মহাগৌরী।

স্কন্দমাতা, কালরাত্রি সন্তানবৎসলা দেবীমূর্তি; শৈলপুত্রী, কাত্যায়নী কন্যাস্বরূপা; আর মহাগৌরী হরপ্রিয়া—হরমনমোহিনী।

নহবতের ছোট্ট কুঠুরিতে এসেছিলেন অষ্টাদশী। প্রায় পনেরো বছর দক্ষিণেশ্বরে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কাটিয়ে যান। দেখতে যতই বন্দিনী বলে মনে হোক না কেন, তাঁদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে গৌরী মা বলেছেন, দুজনে থাকতেন মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে, এক-একসময় কতদিন দেখাই হয় না, 'তবু দুজনের ভাবই ছিল কত!' সারদার মাথা ধরেছে—উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার খোঁজ করে চলেছেন। ভাইঝি মনে করে 'তুই' বলে ফেলেছিলেন একবার : ''দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।'' পরে

যখন ভুল বুঝতে পারলেন, তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হলেন : ''কিছু মনে কোরো না গো।'' তাতেও হল না, পরদিন নহবতে গিয়ে মাকে বললেন, ''দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি, কেন এমন রূঢ়বাক্য বলে ফেললুম।''

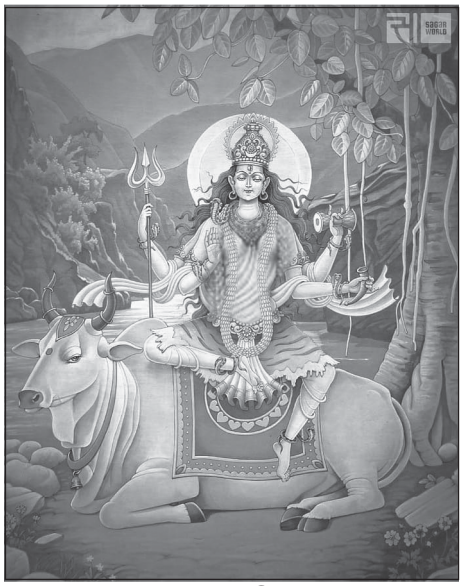
মহাগৌরী

মহাগৌরী কিন্তু মানিনীও কম নন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ভক্তেরা যা-কিছু ফলমিষ্টি আনতেন, তিনি সেসবই পাঠিয়ে দিতেন নহবতে। আর মা এত খাওয়াতে ভালবাসতেন সকলকে যে, ঠাকুরের জন্য অগ্রভাগ তুলে রেখে বাকি সব বিলিয়ে দিতেন ভক্তদের বা পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের। এক-একসময় এজন্য অসুবিধাও হত। একদিন মাকে একটু বোঝানোর জন্য ঠাকুর অনুযোগের সুরে বললেন, ''এত খরচ করলে কী করে চলবে?'' শুনেই মা একটাও কথার উত্তর না দিয়ে পেছন ঘুরে চলে গেলেন নহবতে। ব্যস ভোলানাথের মাথায় হাত! তাড়াতাড়ি ভাইপো রামলালকে ডেকে পাঠান, ''ওরে রামলাল, তোর খুড়িকে ঠান্ডা কর গিয়ে। ও রাগ করলে, (নিজেকে দেখিয়ে বললেন) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।''

আশ্চর্য ভগবদ্‌ভাবে তন্ময়, অর্থের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অবর্তমানে মায়ের যাতে অসুবিধা না হয় এই ভেবে বলরামবাবুর কাছে কিছু টাকা রেখে যান। সেই টাকা জমিদারিতে খাটিয়ে বলরামবাবু পরে মাকে ছমাসে ত্রিশ টাকা করে পাঠিয়ে দিতেন। সেই আনা-পাই-এর যুগে পাঁচ-ছয় টাকায় একজনের খাওয়া-খরচ চলে যেত।

স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ লিখেছেন, ''লঙ্ঘিবে হিমাদ্রিশির হেরিতে কৈলাস—/ হর-গৌরী পুণ্যলীলা যথা সুপ্রকাশ?/ জয়রামবাটী এসে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে/ সেই হর সেই গৌরী হল মূর্তিমান।''

মহাষ্টমী তিথিতে বাংলার গৃহে গৃহে মণ্ডপে মণ্ডপে বিরাজ করেন মহাগৌরী। ''শিবের সনে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী/ আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী/ গৌরী এল দেখে যা লো/ ভবের ভবানী আমার ভবন করিল আলো।''

হে মহাগৌরী ভগবতী সারদা, তুমি তো শুধু আশ্বিনের শারদীয়ায় নয়—বছর জুড়ে বিরাজ করছ। এবারে যে আমাদের হৃদয়ভবনটি আলোকিত করতে হবে মা!

মহানবমী তিথির দেবী সিদ্ধিদাত্রী। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের নাশ হয়েছিল এই দিনে, মহিষাসুর বধও হয় নবমী তিথিতে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গাস্তব করতে বলেছিলেন। অর্জুন সিদ্ধিদায়িনী মাকে আরাধনা করেন যুদ্ধজয়ের জন্য। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে আকাশচারিণী দেবী বর দেন, ''স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রুন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।''

আমরা দুর্গাপূজায় যে-সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ করি তার মূল কাহিনি হল রাজ্যহারা সুরথ রাজা এবং পারিবারিক সম্পর্কের বিশ্বাসঘাতকতায় বিধ্বস্ত এক ধনী বণিকের কাহিনি। প্রধান সমস্যা তো এই দুটিই—হয় নিজের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং অর্থ

সিদ্ধিদাত্রী

হারিয়ে যাচ্ছে; নয়তো চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেই সম্পর্কগুলো যার ভরসায় এতদিন শ্বাস নিচ্ছিলাম। বুকের মধ্যে নিমেষে নিমেষে ছিঁড়ে যায় যে-সম্পর্কের সুতোগুলো তাতে গিঁট বাঁধার ব্যর্থ মরিয়া চেষ্টায় আয়ুক্ষয়, ধনক্ষয়। চিরন্তন দুটি সমস্যা নিয়ে সার্বিক মানবজাতির প্রতিনিধি দুটি মানুষ এক সন্ন্যাসীর কাছে এসেছেন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। সন্ন্যাসী কেন? কারণ তিনি এই দুটি সাম্রাজ্যের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বলেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে পারবেন।

মেধামুনি রাজা এবং বণিককে জানালেন আকর্ষণের স্বরূপ এবং কারণ। এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মহামায়ার আরাধনা করতে বললেন। সমস্ত চণ্ডী জুড়ে দৈত্যদলনী মায়ের নানা ভূমিকার গল্প বলেছেন মেধাঋষি, যার সারমর্ম : সৎ ব্যক্তিরা কোনও অসৎ অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে দেবীকে প্রার্থনা করছেন এবং তার উত্তর পাচ্ছেন। দেবী সুরথরাজা এবং সমাধি বৈশ্যকেও বর দিলেন। রাজা ফিরে চাইলেন রাজ্যপাট আর বণিক বললেন, ''আর নয় মা, আমি ক্লান্ত—আমায় তুমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত করো। আমি এই শতবন্ধনের বাঁধন থেকে মনে মুক্তি চাই।'' দুজনেই দেবীর আশিসে ধন্য হয়েছিলেন।

জয়রামবাটীতে, উদ্বোধনে বা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা সারদার আশীর্বাদে কারও দীর্ঘ রোগ ভাল হয়, কারও দুর্বৃত্ত স্বামী স্বাভাবিক হয়, কেউ স্বপ্নে দেখা গুরুমূর্তিকে সামনে দেখে চমকে যায়, কারও হাতে মা তুলে দেন গেরুয়া বসন। ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্,'' যে তাঁকে যেভাবে চায় তাকে তিনি সেভাবেই পূর্ণ করেন। একদিন এক সন্ন্যাসী এসেছেন উদ্বোধন বাড়িতে। সাধুটি ওপরে উঠে মাকে প্রণাম করে নেমে একতলায় বসে রইলেন। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নন। একটু পরে মা তিনটি ফল পাঠিয়ে দিলেন তাঁর জন্য। তিনি ফল পেয়ে কিছুই বললেন না, নিঃশব্দে বসে রইলেন। অনেকটা সময় কেটে গেল। ভিক্ষা দেওয়া তো হয়ে গেছে। সাধু তবুও বসে আছেন কেন? কী চান তিনি? যাঁরা যেতে আসতে সন্ন্যাসীকে দেখেন, তাঁরা অবাক হন। কেউ কেউ বলেই ফেলেন—''সাধুবাবা, আপনাকে তো মা ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখনও বসে আছেন?'' কোনও উত্তর দেন না তিনি, বসে থাকেন—যেন কিছুর অপেক্ষা করছেন। ঘণ্টাখানেক পর মা তাঁকে আর-একটি ফল পাঠালেন। আশ্চর্য, চতুর্থ ফলটি হাতে পেয়েই সাধু আনন্দে নাচতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, ''শেষ পর্যন্ত মা আমায় মুক্তি দিয়েছেন।'' আগের তিনটি ফল হল—ধর্ম, অর্থ এবং কাম। সন্ন্যাসী ত্রিবর্গ নিয়ে কী-ই বা করবেন—তিনি যে মোক্ষফলের প্রত্যাশী! মা প্রথমে তিনটি ফল হাতে তুলে দিয়ে সন্তানকে পরখ করে নিলেন হয়তো। মোক্ষকামী পুত্রের প্রার্থনাপূরণের জন্য সিদ্ধিদাত্রী দেবীর কাছে সরব প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না। অন্তর্যামিনী যে পিঁপড়ের পায়ের

নূপুরধ্বনিও শুনতে পান!

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত পূজারির যুগান্তকারী পূজার কথা। তাঁর সামনে আলপনা শোভিত পীঠে বসে আছেন যে-দেবী, তাঁরই উদ্দেশে প্রার্থনা করে চলেছেন তিনি : ''হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুর-সুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো, ইঁহার শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন করো।'' ত্রিপুর-সুন্দরীর সাক্ষাৎ অবতরণ অনুভবে যাঁকে তিনি পূজা করতে চলেছেন, তাঁর দুটি রূপের বিশেষ প্রকাশের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন—একটি হল সিদ্ধিদাত্রী রূপ, দ্বিতীয়টি সর্বকল্যাণময়ী জননীমূর্তি।

''এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃপুনঃ।/ সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥''—জগৎপালনের জন্য দেবী ভগবতী স্বরূপত নিত্যা হলেও আবার আবির্ভূতা হয়েছেন। বিষ্ণুদেব তাঁর বিষ্ণুমায়াকে, তাঁর লীলাসঙ্গিনীকে এবারে যে-ভার অর্পণ করেছেন তার জন্য তাঁকে অসুরবিনাশিনী রণরঙ্গিণী রূপ ধারণ করতে হয়নি—তাঁর এবারের রূপটি করুণাঘনমূর্তি। সর্বংসহ, স্বার্থশূন্য মাতৃভাবের একটি ছাঁচ রেখে গেছেন ঈশ্বর। আর সেই দায়ভার স্বীকার করে অগণিত পিঁপড়ের সার, 'মা, মা' ডাকে ব্যাকুল সন্তানদের অকাতরে কোলে তুলে নিয়েছেন ঈশ্বরী। কখনও কাছে বসিয়ে স্নেহে যত্নে তাদের শতসহস্র জাগতিক দুঃখ দূর করেছেন, কখনও বা তাঁর কঙ্কণপরা হাতদুটি ইচ্ছামাত্র পরাজ্ঞান দিয়েছে সন্তানদের। তাঁর বিরাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না।

সেই উচ্ছলিত মঙ্গলঘটের বারিধারা আজও ঝরে পড়ছে। যেন সেই সুধাধারায় আমাদের এই লুকিয়ে-রাখা, ধূলায়-ঢাকা মনটিকে আমরা ধুয়ে নিতে পারি। আমাদের কাছে মহাশক্তিময়ী কেবল 'মা' হয়ে এসেছেন; বড় আপন-করা সেই রূপের ধ্যানে, স্মরণে-মননে, প্রার্থনায়-আরাধনায় আমরা যেন সিদ্ধিদায়িনীকে স্বরূপে অনুভব করতে পারি। ✠

সমাপ্ত

ছুটির বিজ্ঞপ্তি

১৮ মার্চ ২০২২ দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নিবোধত কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

ভ্রম সংশোধন

গত জানুয়ারি ২০২২ সংখ্যায় পৃঃ ৫৪১-এর ডানস্তম্ভের চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে স্বামী অভেদানন্দজী স্থলে স্বামী সারদানন্দজী হবে।